পঞ্চায়েত ভোটের ফল ও সিপিএম-এর ভবিষ্যৎ : একটি প্রতিবেদন

-- পিনাকী মিত্র

রাজ্যের পঞ্চায়েত ভোটের ফল বেরিয়েছে। শাসকদল এবং বিরোধী দুপক্ষেরই দূরতম কল্পনার বাইরে গিয়ে গ্রামবাংলার মানুষ সিপিএমের বিরুদ্ধে তাঁদের রায় দিয়েছেন। বামফ্রন্টের ৩১ বছরের শাসনকালে এতবড় ধাক্কার মুখোমুখি তাদের কখোনো হতে হয় নি। অপ্রত্যাশিত বলেই এই ধাক্কার তীব্রতা আরও বেশী। খুব স্বাভাবিকভাবেই আবার সামনে চলে এসেছে গত দুবছর যাবৎ বামফ্রন্টের তথা সিপিএমের পথ চলাকে ঘিরে চলতে থাকা যাবতীয় বিতর্কগুলো। আমরা এই লেখায় পঞ্চায়েতের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে সেই পুরোনো বিতর্কগুলো আবার একটু খুঁচিয়ে তুলব। যেসব সৎ নিষ্ঠাবান পার্টিকর্মী ও সমর্থক বা বামমনস্ক মানুষ এখনো এই দলটিকে ঘিরে স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের দেখানোর চেষ্টা করব, যে রাস্তায় দলীয় নেতৃত্ব তাঁদের নিয়ে চলেছেন, সেই রাস্তার শেষে কেবলমাত্র ধ্বংস লেখা আছে।

আলোচনাটা এইভাবে শুরু করা যেতে পারেঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের এই ফলাফলকে সিপিএম নেতৃত্ব কিভাবে দেখছেন? এখনো অব্দি আমরা যা যা মন্তব্য পাচ্ছি শুধু সেগুলোকেই যদি কাটাছেঁড়া করা যায়, অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জায়গা তৈরী হয়।

১) নেতৃত্বের একাংশ দেখাতে চাইছেন এই ফলাফল এমন কিছু খারাপ নয়। কয়েকটি জেলায় একটু খারাপ হয়েছে। আবার সেটা সামলে নেওয়া যাবে। উল্টে তাঁরা একথাও বলছেন যেভাবে গত দুবছর ধরে মিডিয়া, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা এবং বুদ্ধিজীবিদের একাংশ তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছে, সেই দিকটা মাথায় রাখলে এই ফল নাকি যথেষ্ট ভালো।(প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় গণশক্তি-র একটি লেখা
http://bangla.ganashakti.co.in/shownews.php?w=896&h=957&year=2008&month=5&date=23&page=4&dpn=165870)

এই প্রসঙ্গে দুটো কথা বলার। **প্রথমতঃ**, যাঁরা এই কথা বলছেন, তাঁরা পার্টিকে এই সতর্কবার্তা আগাম দিয়েছিলেন কি? দেন নি। কারণ তাঁরা নিজেরাও আন্দাজ করেননি যে এইরকম বিপর্যয় হতে চলেছে। তাহলে খামোখা এখন বাস্তব থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিতে চাইছেন কেন? পার্টিকর্মীদের প্রকৃত বাস্তবটা না দেখানোর মধ্যে কোন মহত্ব লুকিয়ে আছে? নাকি গ্রামের গরীব মানুষের থেকে বিচ্ছিন্নতার এই যে বাস্তবতা - সেটা নিজেরাই দেখতে চাইছেন না? **দ্বিতীয়তঃ**, ফলাফল খারাপ হওয়াকে অস্বীকার করা মানেই আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে না দেখা। সেটা আরও খারাপ। এবং এইটা হল সিপিএম-এর সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা। যেকোন ডগম্যাটিক রাজনীতি যেভাবে নিজেরা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার আগের দিন পর্যন্তও নিজেদের ভুল-ত্রুটি খুঁজে পায় না, অথবা নিজেরা যেটুকু খুঁজে পায় - শুধু সেটুকুকেই 'ভুল' বলে ভাবে, অন্যের কাছ থেকে, বিশেষতঃ বিরোধীদের কাছ থেকে কোন সমালোচনা বা

ভুল-ত্রুটি সম্পর্কিত মতামত গ্রহণ করতে তাদের সম্মানে লাগে, সিপিএমও এক্ষেত্রে কোন ব্যাতিক্রম তৈরী করতে পারেনি। বিরোধী সমালোচনাকে গুরুত্ব দিয়ে শোনার কোন সংস্কৃতিই আর অবশিষ্ট নেই দলের মধ্যে। তাই প্রথম থেকেই নেতৃত্বের একাংশ "ফলাফল তেমন খারাপ হয় নি" বলার মাধ্যমে আসলে আত্মসমীক্ষার জায়গাটিকেই লঘু করে দিচ্ছেন।

২) দ্বিতীয় যে মতটা উঠে আসছে, সেটা খুবই কমন। বহুদিন ধরেই যেকোন পরাজয়ে সিপিএম এর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া এইটাই হয়ে থাকে। অন্ততঃ বাংলার মানুষ শুনে শুনে অভ্যস্ত। সেটা হল : "মানুষ ভুল বুঝেছেন"। এর মধ্যে যেটা অনুক্ত থাকে, সেটা হল - পার্টি ঠিক বুঝেছে। তো কেউ যদি বিশ্বাস করে যে সে-ই ঠিক, আর বাকীরা ভুল, সে কিরকম আত্মসমালোচনা করবে - সেটা বোঝাই যায়। ফলে এই আত্মসমালোচনা নামক প্রহসনটি থেকে যে কর্মসূচীটি বেরিয়ে আসবে তা হল : মানুষকে আরো ভালো করে 'বোঝাতে' হবে। এই 'বুঝিয়ে দেওয়া' নামক কর্মসূচীটির আবার বহুমুখী তাৎপর্য আছে। যেকোন বোঝানো প্রথমে মিষ্টি কথায় এবং যথেষ্ট বিনয় সহযোগে শুরু হয়। তাতে কাজ না হলে যিনি বোঝাচ্ছেন তিনি ক্রমশঃ অধৈর্য হতে থাকেন। এবং তিনি যেহেতু জানেন যে তিনিই ঠিক, তাই যে বুঝতে চাইছে না, তার না বোঝার কোন কারণ তিনি আবিস্কার করতে পারেন না, একমাত্র অজ্ঞতা (অশিক্ষিত গাঁএর মানুষ হলে) অথবা কায়েমী স্বার্থ (শিক্ষিত শহুরে মানুষ হলে) ছাড়া। তাই বুঝতে না চাওয়া, মানতে না চাওয়া মানুষের গায়ে দুটি ট্যাগ লেগে যায় - হয় 'পিছিয়ে পড়া' বা 'প্রতিক্রিয়াশীল'। এখন পিছিয়ে পড়াদের কে-ই বা উদ্ধার করবে পার্টি ছাড়া ? পার্টিকে সেইসব পিছিয়ে পড়াদের 'বাধ্য' করতে হবে আলোর দিকে এগিয়ে চলতে। সেটা মোটেও অগণতান্ত্রিক নয়, কারণ তার পিছনে রয়েছে পার্টির ভালোমন্দ বিষয়ক 'সঠিক জ্ঞান'। বাবা মা কি সন্তানদের জোর করেই ঠিক কাজটা করান না ? তাই পিছিয়ে পড়া মানুষের উপর সদিচ্ছার জোর, বাৎসল্যের জোর খাটানোর যুক্তিজাল তৈরী হয়। আর প্রতিক্রিয়াশীলদের তো আর 'বোঝানো' যাবে না, তাদের 'মানতে বাধ্য করতে' হবে। অতএব শুরু হয় মানতে বাধ্য করার প্রক্রিয়া। বলা বাহুল্য, সেই প্রক্রিয়াটি অহিংস থাকে না সবসময়। কিন্তু সুবিধে হল, সহিংস হলেও, তার আগেই কিন্তু সেই হিংসার স্বপক্ষে একটি মজবুত জাস্টিফিকেশন মনের গভীরে তৈরী হয়ে গেছে। এইভাবেই একটা আপাতঃ গণতান্ত্রিক এবং বিনয়ী দৃষ্টিভঙ্গী অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে নিজের ভিতরেই হিংসা আর অগণতন্ত্রের বীজ বয়ে নিয়ে চলে।

৩) গত দুই বছরে এই প্রথম সিপিএম নেতৃত্ব স্বীকার করলেন "ঔদ্ধত্য" তাঁদের জনবিচ্ছিন্নতার একটা কারণ। কিন্তু তাঁরা যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে নিচুতলার কর্মীদের ঔদ্ধত্যের কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য এটা আর একটা গা বাঁচানো বক্তব্য এবং সত্য থেকে বহুদূরে। নিচুতলার কর্মীদের কাছে অসম্মানজনকও বটে। সত্যিটা এইটাই যে ঔদ্ধত্য অনেক বেশী দেখিয়েছেন শীর্ষ নেতৃত্ব। সেই "আমরা ২৩৫, ওরা ৩০, আমাদের কে আটকাবে ?" থেকে শুরু করে "পেইড ব্যাক ইন দেয়ার ওন কয়েন", "লাইফ হেল করে দেব" বা সাম্প্রতিক কালে রাজ্যপাল বা 'স্বজন' এর উদ্দেশ্যে করা মন্তব্যগুলো যদি এক এক করে রাখা যায়, দেখা যাবে ঔদ্ধত্যের তালিকায় সবার উপরে নাম থাকবে বুদ্ধ, বিমান, বিনয় ও শ্যামলবাবুদের। (সুভাষ চক্রবর্তী বা লক্ষ্মণ শেঠ এর নাম উল্লেখ করলাম না, কারণ কোন বামপন্থা বিষয়ক অলোচনায় এদের নাম আনা মানে

আলোচনাটিকে দূষিত করা)। বলা যায় অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁরা এই ঔদ্ধত্যকে নিচুতলায় পারকোলেট করেছেন। গোটা নন্দীগ্রাম পর্বে নিজেদের পার্টিকে উজ্জীবিত করতে দিনের পর দিন ভায়োলেন্স-এ উস্কানি দিয়েছেন। সমাজবিরোধীদের দিয়ে নন্দীগ্রাম দখল অভিযানকে জাস্টিফাই করতে গোটা পার্টিকে "যুদ্ধং দেহি" মুডে নিয়ে গেছেন। "মার এর বদলা মার" - এটাকে গোটা পার্টির টিউন বানিয়ে ফেলেছেন, এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন গণফৌজ মার্চ করছে নন্দীগ্রামে (অথচ সত্যিটা হল সমাজবিরোধীরা মার্চ করছিল তখন), ভেবেছিলেন assertively যদি একবার নন্দীগ্রামের দখলটা নিয়ে নেওয়া যায়, তাহলেই ওটাকে কেশপুর বানিয়ে দেওয়া যাবে আর গোটা বাংলার গ্রামের মানুষের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাবে যে জমি অধিগ্রহণ আটকাতে গেলে নন্দীগ্রামের পরিণতি হবে। বলা বাহুল্য এটা তাঁদের দূরদৃষ্টির অভাব। কিন্তু আজ যখন এই নীতি ব্যাকফায়ার করেছে তখন সব দোষ নিচুতলার কর্মীদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা যে হাত ধুয়ে ফেলতে চাইছেন - সেটা তাঁদের পলায়নী মনোবৃত্তিকেও সামনে নিয়ে আসছে।

৪) প্রসঙ্গ conspiracy theory: বিগত দুবছর ধরে সিপিএম নেতৃত্ব কর্মীদের বুঝিয়েছেন শাসকশ্রেণীর মদতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়শীল এবং অতিবামপন্থীরা একজোট হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছে। তার কারণ তাঁরাই প্রকৃত বামপন্থী রাস্তায় হাঁটছেন। তাঁরাই একমাত্র খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ দেখছেন। এবং যেহেতু এর ফলে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছে, তাই তারা লাগাতার অপপ্রচার করে চলেছে। প্রথমদিকে তাঁরা এই থিওরি খুব একটা ভালো দাঁড় করাতে পারছিলেন না। কারণ, স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছিল, এতদিন তাহলে কি শাসকশ্রেণীর স্বার্থ বিঘ্নিত হচ্ছিল না ? আজ হঠাৎ কি এমন ঘটল যে শাসকশ্রেণী এরকম আদাজল খেয়ে নামলো ? যেখানে ২০০৬ এর বিধানসভা নির্বাচনেও সাধারণভাবে জনমত পক্ষেই ছিল এবং শাসকশ্রেণীকেও কোন অপপ্রচার করতে দেখা যায় নি। সাধারণ মানুষ বা বাম মনস্ক বুদ্ধিজীবিদেরই বা হঠাৎ করে কেন এমন পরিবর্তন হয়ে গেল যে যাঁরা ২০০৬ এর নির্বাচনেও সিপিএমকে ভোট দেওয়ার কথা প্রচার করেছিলেন, তাঁরাই রাতারাতি 'শাসক শ্রেণী'-র লোক হয়ে গেলেন ? বিশেষত: শিল্পায়নের যে নীতি সিপিএম নিয়ে চলছে, তাতে তো বড় পুঁজির খুশি হওয়ার কথা, হচ্ছেও। সিআইআই, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স থেকে শুরু করে শিল্পপতিদের সব সংগঠন বুদ্ধবাবু, নিরুপম সেনদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছে। গোটা সিঙ্গুর পর্ব জুড়ে শাসকশ্রেণীর পত্রিকা আনন্দবাজার জোর গলায় সিপিএম এর শিল্পনীতির পক্ষে সওয়াল করে গেছে। সব মিলিয়ে শাসকশ্রেণী তো বেশ ফুরফুরে মেজাজেই ছিল। তাদের 'স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া' বা 'চক্রান্তের' কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এমনই সময়ে সিপিএম নেতৃত্ব একটা যুৎসই অজুহাত খুঁজে পেলেন। ১২৩ চুক্তি এবং আমেরিকা। এইবার রোমহর্ষক গোয়েন্দা গল্পের ঢং এ থিওরি নামলো - ১২৩ চুক্তিকে যেহেতু সিপিএম বাধা দিচ্ছে, তাই তাদের কোনঠাসা করার জন্য আমেরিকা তৃণমূল, মাওবাদী এবং 'সুশীল সমাজ' কে টাকা দিয়ে এই চক্রান্তের জাল বুনেছে। এই থিওরির প্রবক্তারা খুবই ইনোভেটিভ - সন্দেহ নেই। সমস্যা হল, তাঁরা এই থিওরি দিয়েই পঞ্চায়েতের ভরাডুবির ব্যখ্যা দিচ্ছেন এবং আবারও পার্টির আত্মবিশ্লেষণের গুরুত্বকে লঘু করে

দিচ্ছেন। সিপিএম যত যত বেশী পরিমাণে এই ধরণের কল্পনাশক্তির অধিকারী নেতৃত্বের উপর নির্ভর করবে, তত বেশী এরকম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে - একথা বুঝতে খুব বেশী রাজনীতি বোঝার দরকার পড়ে না।

৫) এবার শিল্পায়ন এবং জমি অধিগ্রহণ প্রসঙ্গ। আপাতত: খবরের কাগজে যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তাতে এবিষয়ে সিপিএম এর অভ্যন্তরে বিতর্ক তীব্র। একাংশ বলছেন জমি অধিগ্রহণের বিষয়টা এবারের নির্বাচনের খারাপ ফলের পিছনে কোন ভূমিকা নেয় নি। স্বপক্ষে যুক্তি হিসেবে তাঁরা বলছেন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, প: মেদিনীপুর - ইত্যাদি যেসব জায়গায় যেখানে জমি নেওয়া হয়েছে বা হওয়ার সম্ভবনা আছে - সেখানে দারুণ ফল হয়েছে দলের। অথচ দ: ২৪ পরগণায় - যেখানে সেরকম কোন সম্ভবনা নেই - সেখানে ভরাডুবি হয়েছে। অন্য অংশের দাবী-জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা গ্রামের মানুষের মনে ভীতি তৈরী করেছে। সামগ্রিকভাবে তারই ছাপ পড়েছে পঞ্চায়েতের ভোটে।

পরিষ্কারভাবেই প্রথম অংশ, যাঁরা জমি অধিগ্রহণের এবং বড় পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্পায়ন নীতির প্রবক্তা-তাঁরাই সিপিএমের মধ্যে এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই অংশটি ভালোরকম পুঁজিবাদী ধ্যানধারণায় আচ্ছন্ন। বিপ্লব-টিপ্লব এঁদের দূরতম কল্পনাতেও অ্যাজেন্ডা নয়। বরং এঁরা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন সংসদীয় পথেই যা করার করতে হবে এবং তাই সরকারে থাকাটাই শেষ কথা (মুখ ফুটে হয়তো বলতে পারেন না 'মার্কসবাদী' ইমেজের কারণে)। এঁদের কাছে 'বামপন্থা' মানে বড়জোর দক্ষিণপন্থীদের তুলণায় একটু pro-people সরকার চালানোর চেষ্টা করা। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়।

ফলে এই অংশটির বৃহৎ পুঁজিকেন্দ্রিক শিল্পায়নে (সেটা ম্যানুফ্যাকচারিং হোক কি রিয়েল এস্টেট) এবং তার জন্য যেকোনো মূল্যে জমি অধিগ্রহণে কোনো দ্বিধা বা অপরাধবোধ কখনো ই ছিল না। এখনও নেই। দুটি যুক্তিকে এনারা আত্মস্থ করেছেন:

(১) সব রাজ্য শিল্পপতিদের ছাড় দিচ্ছে। আমরাও না দিলে শিল্পপতিরা আসবেন না। আমরা 'পিছিয়ে' পড়ব।

(২) বৃহৎ পুঁজির জন্য জমি অধিগ্রহণ বা উচ্ছেদের ফলে যাই জীবিকাচ্যুতি ঘটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত 'ট্রিকল ডাউন' এফেক্টে মোট কর্মসংস্থানের পরিমান অনেক বেশী হবে। কাজেই এই জীবিকাচ্যুত মানুষগুলোর কোনো না কোনো ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে যাবে।

স্পষ্টত:ই এই যুক্তিদুটি নিওলিবারেলিজমের কাছে আত্মসমর্পণের যুক্তি এবং এর সাথে মার্কসবাদ, শ্রমিকশ্রেণী - ইত্যাদির কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু তাই নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই যুক্তিদুটিকে মোকাবিলা করেই প্রতিনিয়ত বামপন্থীদের নিজেদের দক্ষিণপন্থীদের থেকে আলাদা করতে হয়। কিন্তু সিপিএম নের্তৃত্বের এই অংশের এই দুটি যুক্তির ওপর এমন আস্থা যে তাঁরা এখন এই বিপর্যয়ের বাজারেও assert করছেন এই বলে যে, আরো দ্রুতগতিতে জমি অধিগ্রহণ

করে শিল্পায়ন করতে হবে। তাতেই নাকি উদ্ভুত সংকটের থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।

নেতৃত্বের যে অন্য অংশটি জমি অধিগ্রহণকে দায়ী করছেন নির্বাচনে খারাপ ফলের জন্য, তাঁদের মধ্যে আবার দু-রকম মতামত দেখা যাবে।একদল জমি অধিগ্রহণের পুরো ব্যাপারটাকে বিরোধিতা করেন না। মোটের ওপর ঠিক বলেই মনে করেন। অর্থাৎ রাজনীতিগত দিক থেকে প্রথম অংশের সাথে তাঁদের মতবিরোধ নেই সেরকম। কিন্ত তাঁরা একটু ধীরে চলার পক্ষপাতী। তাঁরা চান মানুষকে সঙ্গে নিয়ে, তাদের আরো বুঝিয়ে সবকিছু করতে। অর্থাৎ নিওলিবারেল চিন্তা এঁদেরকেও আচ্ছন্ন করেছে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় প্রথম অংশের মতো এদের গণতান্ত্রিক বোধকে ধ্বংস করে দিতে পারে নি। আর এঁদের মধ্যেই আর একটি অংশ পাওয়া যাবে, যাঁরা এই শিল্পায়ন নীতির পুরোপুরি বিপক্ষে বা কনফিউজ্‌ড্‌। দোদুল্যমান। তবে এই অংশটি মাইনরিটি এবং দলীয় নীতি নির্ধারণে এঁদের ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদিও লেখকের মতে সিপিএমের মধ্যে এই অংশটিই সবচেয়ে প্রগতিশীল এবং সিপিএম ভারতের কমিউনিস্ট অন্দোলনে আদৌ কোনো সদর্থক ভূমিকা রাখতে পারবে কিনা সেটা পুরোপুরি নির্ভর করছে এই শেষ অংশটি কতটা ভোকাল এবং নীতি নির্ধারক জায়গায় নিজেদের তুলে আনতে পারছেন - তার উপর।

এখন আমাদের বক্তব্যে আসা যাক। প্রথমতঃ নেতৃত্বের যে অংশ বোঝানোর চেষ্টা করছেন যে জমি অধিগ্রহণ ভোটের ফলকে প্রভাবিত করেনি তাঁরা ভুল বলছেন। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পঃ মেদিনীপুরের যে সব জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো অধিকাংশই চাষযোগ্য নয়। সেখানে জমি অধিগ্রহণের ফলে মানুষকে জীবিকা হারিয়ে পথে বসতে হয়েছে - এরকম উদাহরণ নেই। উল্টোদিকে সিঙ্গুর, যেখানে এর মধ্যেই ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে বিনা চিকিৎসায় অথবা মানসিকঅবসাদে অত্মহত্যার কারণে। নন্দীগ্রমে মানুষকে ভিটে, মাটি, জীবন, জীবিকা সবকিছু থেকেই উৎখাত হতে হতো। ডানকুনিতেও প্রভূত উচ্ছেদের পরিকল্পনা রয়েছে। এবং দেখা যাচ্ছে এই তিনটে জায়গাতেই ভোটে সিপিএম-কে প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ। এই তিন জায়গাতেই রায় তাই খুব পরিস্কার ভাবে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে। এর সাথেই রয়েছে জমি অধিগ্রহণের অগণতান্ত্রিক, গা- জোয়ারি পদ্ধতি এবং সেখানকার প্রতিরোধকে পুলিশ বা দলের আশ্রিত সমাজবিরোধী দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নৃশংস ‘নন্দীগ্রাম লাইন’। মানুষ আতংকিত হয়েছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে, তাদের ঘৃণার প্রতিফলন পড়েছে ভোটের বাক্সে। হ্যাঁ অন্যান্য কারণ অবশ্যই আছে, রেশন কেলেঙ্কারী যার মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য। সাচার কমিটির রিপোর্ট, স্বজনপোষণ, দলীয় অন্তর্ঘাত - হয়তো সব-ই আছে। কিন্তু বাকী সব কারণকে মুখ্য বলে তুলে ধরে যাঁরা জমি অধিগ্রহণ ও সেই সংক্রান্ত দমনপীড়ন কে গৌণ করে দিতে চাইছেন, তাঁরা আসলে বস্তুনিষ্ঠ সত্যের বদলে বৃহৎ পুঁজির চাহিদাকে প্রতিফলিত করছেন। (সেটা সজ্ঞানে না অজ্ঞানে সেটা অবশ্যই তাঁদের দলীয় কর্মীরাই ভালো বলতে পারবেন।)

কাজেই দেখা যাচ্ছে জমি থেকে বা জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করে বৃহৎপুঁজির দাবী মেটানোর এই যে শিল্পায়ন, গ্রামের কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের একটা বড়ো অংশের রায় তার বিরুদ্ধে গেছে। এই ফলাফল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে বৃহৎপুঁজির প্রদর্শিত উন্নয়নের পথ যদি একটি

সর্বহারার পার্টির অভিমুখ হয়, তাহলে সর্বহারার তার থেকে বিচ্ছিন্নতা অনিবার্য। শুধু সর্বহারার পার্টি বলে নয়, বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন বাড়ার ফলে কোন দলের পক্ষেই নিওলিবারেল পলিসি অনুসরণ করেও দিনের পর দিন শ্রমজীবী মানুষের আস্থা ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ভারতের সব রাজ্যেই এটা দেখা যাচ্ছে। আবার পাশাপাশি এটাও আংশিকভাবে সত্যি (পুরো সত্যি বলা যাবেনা, কারণ এই পথটি এখনো অবধি unexplored), যে আজ যদি সিপিএম শ্রমজীবী মানুষের সাথে একাত্মতাকে প্রায়োরিটি দেয়, শিল্পপতিরা এরাজ্যকে প্রত্যাখ্যান করতেও পারে। যতটা রঙ চড়িয়ে এই আশংকাকে দেখানো হয়, সেটা বাড়াবাড়ি হলেও সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়ার মতন ব্যাপারও না। সেক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের একটা সংকট তৈরী হতে পারে এবং সেখান থেকে দক্ষিণপন্থীরা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে সরকারকে ফেলে দিলেও দিতে পারে। এরকম সম্ভাবনাও যে একেবারে নেই, তা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় এই পথটিকে সিপিএম নেতৃত্ব এখনো অবধি এড়িয়ে চলেছেন, মূলতঃ তিনটি কারণে --

(১) তাঁদের ধারণা বৃহৎ পুঁজিকেন্দ্রিক এই শিল্পায়ন যাই কাজ তৈরী করতে পারুক না কেন, এর গ্ল্যামার এবং বিনিয়োগের আয়তনের কারণে তা একধরণের aspiration তৈরী করতে সক্ষম, যা বহু মানুষের মধ্যে কাজ পাওয়ার একটা আশাবাদকে চারিয়ে দিতে পারে। বৃহৎ পুঁজির বিনিয়োগকে কেন্দ্র করে এই যে aspiration-এর বৃত্ত, তার পরিধির বাইরে যে প্রান্তিক মানুষজন থাকবে, তাদের ঐ বৃত্তের ভিতরে প্রতিনিয়ত ঢোকা-বেরোনো চলতে থাকবে। আর এই ঢোকা-বেরোনোর চাবি যদি পার্টির হাতে থাকে, তাহলে পার্টি একভাবে খেটে খাওয়া মানুষের মধ্যে প্রভাবটা ধরে রাখতে পারবে। বৃহৎ পুঁজির পক্ষ নিয়েও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে প্রভাব বজায় রাখার এটাই ছিলো ফর্মুলা। এবং ২০০৬ এর নির্বাচন অব্দি যে এই ফর্মুলা ভালই কাজ করেছে, তাই দ্বিতীয় ঝুঁকির পথটায় যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠেনি এতদিন।

(২) তাঁরা আন্দাজ করতে পারেননি যে এই শিল্পায়ন ফলপ্রসু হবার আগেই কেবলমাত্র প্রস্তুতিপর্বেই তা খেটে খাওয়া মানুষকে এতটা যন্ত্রণা দেবে। সেই যন্ত্রণা যে তাঁদের সাথে শ্রমজীবী মানুষের এতটা দূরত্ব তৈরী করতে পারে, সে-ও তাঁদের ধারণায় ছিলো না। কাজেই বৃহৎ পুঁজির দেখানো পথও যে সরকারের টিঁকে থাকার পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে, সেই বোঝাপড়া তাঁদের ছিলো না। উল্টে তাঁরা এটাকে সরকারে টিঁকে থাকার তুলনামূলক সুনিশ্চিত উপায় ভেবেছিলেন। হয়তো সাংগঠনিক শক্তি ও তদ্‌জনিত আত্মবিশ্বাসের কারণে।

(৩) তৃতীয় কারণটি বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বামপন্থীরা সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার বলে জানে। সংগ্রামের অনেকরকম হাতিয়ার হয়, সরকার তার মধ্যে একটা। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব বহুকাল যাবদ অন্য সব হাতিয়ারকে সিন্দুকে ভরে ফেলেছে। সবেধন নীলমণি এই একটি সংগ্রামের (?) হাতিয়ার পড়ে আছে। তাই তারা থিওরাইজ ও করেছেন, 'রিলিফ' আর কোনো অন্তর্বর্তীকালীন বিষয় নয়, স্থায়ী বিষয়। তাই এখন দীর্ঘমেয়াদী সরকারে টিঁকে থাকাই লক্ষ্য। তো এটা যে পার্টির লক্ষ্য (প্লাস একত্রিশ বছরের অভ্যাস), সে যে সরকারে না থাকার সম্ভাবনার

কথা ভাবলেই আতঙ্কিত হবে সে তো বলাই বাহুল্য।

তাই শেষ অব্দি ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এইরকম -- শ্রমিক কৃষকের সংগে আন্দোলনের মৈত্রী না গড়ে তুলতে পারলেও চলবে। কোনোরকমে প্রভাব বজায় থাকলেই হল (অর্থাৎ ভোটটি নিশ্চিত হলেই হল)। তাই বৃহৎ পুঁজিকেন্দ্রিক উন্নয়ন যদি সেই নিশ্চয়তা দেয়, তো অসুবিধে কি ? যেখানে কোনো কারখানায় কোনো শ্রমিক আন্দোলন না করেও শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্টের সাথে বার্গেনিং করার ক্ষমতা হোল্ড করার কারণে, ঠিকা শ্রমিকের কন্ট্র্যাক্টরি করার কারণে প্রভাবটা বজায় রাখা যাবে। কোনো কৃষক আন্দোলন না করেও সরকারী প্রকল্প, সাহায্য, কাজের সুযোগ ইত্যাদির বন্টনের ক্ষমতা ধারণ করার কারণে কৃষক বা ক্ষেতমজুরের উপর প্রভাব বজায় রখা যাবে। এই পথ সাফল্যের সাথে অনুসৃত হয়ে আসছে পশ্চিমবংগে গত কুড়ি বছর ধরে। শুধু সিপিএম নেতৃত্ব যেটা বুঝতে পারেনি সেটা হল-অন্দোলনের মৈত্রী, লড়াইয়ের একাত্মতা আর ক্ষমতাজনিত প্রভাব এক জিনিষ নয়। আরো যেটা বোঝেননি সেটা হল বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসন বাড়লে রিলিফ কর্মসূচীও মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য। তখন শ্রমজীবী মানুষের সাথে একাত্মতা রিলিফ দিয়ে হবে না। হবে আন্দোলন দিয়ে। এটা বোঝেননি বলেই পশ্চিমবাংলার শ্রমিকশ্রেণী অনেক আগেই সিপিএম কে প্রত্যাখ্যান করতে শুরু করছে। সেই ৯০-এর দশক থেকেই, যখন কারখানায় কারখানায় VRS এর নামে শ্রমিক ছাঁটাই চালু হয়েছে আর CITU নেতারা শ্রমিকদের বুঝিয়েছেন আন্দোলন করা যাবে না, করলে কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন সময় এসেছে কৃষকদের। একটিদুটিমাত্র জমি অধিগ্রহণের ঘটনা পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিচ্ছে সিপিএমের। রিলিফের একাত্মতা কতটা ঠুনকো সেটা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিয়ে যাচ্ছে। দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে আত্মসমর্পণকারী সরকারনির্ভর রাজনীতির সীমাবদ্ধতা।

পঃ বঙ্গে সিপিএম তাই এমন এক সংকটের মুখে যা তারা ইতিপূর্বে ফেস করেনি এবং যা আসলে তাদের কেন্দ্রীয় রাজনীতির অনেকগুলো জায়গাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। বৃহৎ পুঁজির আগ্রাসনের মুখে প্রকট হয়ে উঠেছে রিলিফের রাজনীতির সীমাবদ্ধতা। পরিস্কারভাবে কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন তাঁরা।

-- বৃহৎ পুঁজির পক্ষে দাঁড়াবেন ? নাকি শ্রমিক কৃষকের পক্ষে ? (দুপক্ষকে একই সাথে তাল দিয়ে চলার দিন শেষ হয়ে আসছে)

-- যে কোন মূল্যে সরকারে টিঁকে থাকার লাইন আঁকড়ে থাকবেন ? নাকি শ্রমজীবী মানুষের লড়াইএ নেতৃত্ব দেবেন - শিল্পপতিদের বিনিয়োগ না করার হুমকিকে উপেক্ষা করে ?

-- একটা দক্ষিণপন্থী সরকারের মতো অন্য দক্ষিণপন্থী সরকারগুলোর সাথে পুঁজিপতিদের ছাড় দেওয়া এবং SEZ করার প্রতিযোগিতায় নামবেন ? নাকি সারা ভারতজুড়ে SEZ বাতিলের দাবীতে যে ছোট বড় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছে, উচ্ছেদের বিরুদ্ধে যে কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠছে -

সরকার টিঁকিয়ে রাখার পিছুটান ভুলে সেগুলোয় সামিল হবেন ?

এই প্রশ্নগুলোর সদর্থক উত্তরের উপরেই দাঁড়িয়ে আছে পঃ বঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সিপিএম-এর ভবিষ্যৎ।